জনকণ্ঠ

ইসলামপুরের চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

ইসলামপুর ঃ হরিণধরা স্কুলে ছাত্ররা ক্লাস করছে কলাপাতা বিছিয়ে —জনকণ্ঠ

আনোয়ার হোসেন মিন্টু, ইসলামপুর থেকে ॥ প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে ইসলামপুর উপজেলার চরাঞ্চলের অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এখন বেহাল অবস্থা। শ্রেণীকক্ষের অভাব, শিক্ষকস্বল্পতা, দায়সারা গোছের পাঠদান, ছাত্র-শিক্ষকের অনুপস্থিতি, কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় তদারকি এবং সংস্কারের অভাবে এ উপজেলার চরাঞ্চলের অনেক স্কুলের অস্তিত্বই এখন বিলীন হতে চলেছে। জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গন লেগেই আছে। প্রতিবছর বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে পশ্চিম ইসলামপুরের ৫ ইউনিয়নের ৭০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ইউনিয়নগুলো হচ্ছে– কুলকান্দি, সাপধরি, বেলগাছা, নোয়ারপাড়া ও চিনাডুলী। এসব এলাকায় সরকারী ও রেজিস্টার্ড অনেক স্কুল বালুচরে, ফ্লাড সেন্টারে এবং যমুনার দুর্গম দ্বীপচরে একচালা, দু'চালা ঘরে নামমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। কোন কোন স্কুলের ঘর-দরজা নেই বছরের পর বছর। চরাঞ্চলের অধিকাংশ স্কুলেরই চাল আছে, বেড়া নেই। বেড়া আছে তো চাল নেই। নেই প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, এমনকি ব্ল্যাকবোর্ড পর্যন্ত। এসব স্কুলের ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে কলাপাতা, খড়, ছালা, পিঁড়ি, কোথাও আবার খোলা আকাশের নিচে দূর্বা ঘাসে বসে ক্লাস করে। জীর্ণ দশার কারণে বেশিরভাগ স্কুলে আইডিয়াল প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ডি-ক্যাটাগরির কারণে সরকারী উপবৃত্তির টাকা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে চরের অনেক স্কুলের অভাবী ছাত্রছাত্রীরা। বেশিরভাগ স্কুলে টিউবওয়েল ও ল্যাটট্রিনের ব্যবস্থা নেই। উপজেলা সদর থেকে নৌকাযোগে যমুনা পাড়ি দিয়ে অনেক শিক্ষক স্কুলে আসা-যাওয়া করেন। কোন কোন স্কুলে শিক্ষকরা আসেন পালাক্রমে। স্কুলে কাগজ-কলমে ছাত্রছাত্রী বেশি দেখিয়ে শিক্ষকরা হাতিয়ে নিচ্ছেন শিবিখা-এর চাল/গম এবং উপবৃত্তির টাকা।

২১ জুলাই দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হরিণধরা স্কুলে দেখা গেল, বেড়া ছাড়া দু'চালা একটি নড়বড়ে ঘরে বেশ কু'জন ছাত্রছাত্রীকে কলাপাতায় বসিয়ে পাঠদান করছেন দুজন শিক্ষক। স্কুলটিতে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, এমনকি ব্ল্যাকবোর্ড পর্যন্ত নেই। খাতাপত্রে এখানে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৩৮০ জন। শিক্ষক রয়েছেন ৩ জন। স্কুলের শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও এলাকাবাসী জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে স্কুলটির বেহাল অবস্থার কারণে এলাকার শত শত শিশু-কিশোর লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাঁরা জানান, '৯৯ সালের গোড়ার দিকে যমুনায় চলে যায় স্কুলটি। সে সময় সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ও এলাকাবাসীর সহায়তায় স্কুলঘরটি ভেঙ্গে হরিণধরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ওপর আনা হয়। অস্থায়ীভাবে এর কার্যক্রম চলতে থাকে বাঁধে।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও উপজেলা শিক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্কুলটি বর্তমান জায়গায় পুনর্স্থাপনের নির্দেশ দেন। কিন্তু এতে বাদ সাধে এলাকার একটি কুচক্রী মহল। প্রত্যক্ষদর্শী তমিজ উদ্দিন, জালাল উদ্দিন, জামাল শেখসহ অনেকেই জানান, স্থানীয় প্রভাবশালী ছাত্তার প্রামাণিক ও গোলাপ হোসেনের লোকজন দুর্গাপূজার ছুটির সুযোগে স্কুল ঘরটি ভেঙ্গে নিয়ে যায়। দখল করে স্কুলের সকল আসবাবপত্র, উপরন্তু মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট ১৫ জনকে আসামী করে আদালতে একটি মামলাও দায়ের করা হয়। ফলে স্কুলটির কার্যক্রমে প্রায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। উপায়ন্তর না দেখে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ মিয়া সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান সনেট ও ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় সরকার নির্ধারিত হরিণধরা মৌজায় দু'চালা একটি টিনের ঘর স্থাপন করে। আসবাবপত্রের অভাবে সেখানে এখন কলাপাতা বিছিয়ে নামমাত্র শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। ২২ জুলাই দুপুরে ২০ নং চর দিঘাইর স্কুলে দেখা গেল, ৩ জন শিক্ষক কাঠফাটা রোদে তপ্ত বালুচরে ছাতা মাথায় দিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। একটি নড়বড়ে একচালায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বেশিরভাগ ছেলেমেয়েকে বসানো হয়েছে বাইরে খড় বিছিয়ে। প্রধান শিক্ষক গোলাম সারোয়ার ও এলাকার ষাটোর্ধ সাহেব আলী মণ্ডল, তৈয়ব আলী মণ্ডল, পঞ্চাশোর্ধ মজিবর রহমান, আবু তাহেরসহ অনেকেই জানান, যমুনার ভাঙ্গনে পড়ে স্কুলটি ৫ বার স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রায় এক বছর ধরে এ বেহাল অবস্থা চললেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

যমুনার বুকে জেগে ওঠা একটি দ্বীপচরে বেড়া ছাড়া একচালা একটি জীর্ণ ঘরে ২৩ নং কাঁশারীডোবা স্কুলের কার্যক্রম চলছে প্রায় ১৪ বছর ধরে। ২২ জুলাই বেলা দেড়টার সময় দেখা গেল, ২৯ জন ছাত্রছাত্রীকে ছালা কিংবা পিঁড়িতে বসিয়ে পাঠদান করছেন দু'জন শিক্ষক। কাগজ-কলমে এখানে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১৯৫ জন। শিক্ষক রয়েছেন ৩ জন। এলাকাবাসী জানালেন, '৮৭ সালে স্কুলটি যমুনা গ্রাস করার পর আর পুনর্নির্মাণ হয়নি। দেয়া হয়নি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। এলাকাবাসী নিজ উদ্যোগে কোনমতে স্কুলটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। স্থানীয় অভিভাবকরা জানালেন, ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসার সময় ছালা ও পিঁড়ি নিয়ে আসে। আর শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে ক্লাস নেন।